ভূমিকা : প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। একথা তিনি নিজেই বলেছেন। নিজের কথা বলতে গিয়ে "আত্মপরিচয়" গ্রন্থে বলেছেন - '

> " নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। ... জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয় আমি কবি মাত্র।
>
> ... যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ায় দিকে দিকে, সুরে গানে, নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখ-দুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোবাসার দ্বন্দ্বে - তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়।" [১]

অন্যত্র, **'Religion of an Artist'** গ্রন্থে বলেছেন, **"My religion is essentially a poet's religion."** - কিন্তু তিনি গীতিকারও। রবীন্দ্রনাথ যদিও সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, তথাপি তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে প্রধাণত কবিতা ও গানের ভিতর দিয়ে।

গানের মধ্যে দিয়েই কবির উত্তরণ, গানের ভিতর দিয়েই তাঁর প্রকাশ। রবীন্দ্র-সংগীতের উৎপত্তি সাহিত্যের ভূমিতে, সুরের আকাশে তার প্রকাশ। এই সুরের আকাশে ভর করেই তিনি কাব্যের জগতে বিচরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও কবিতার সঙ্গে সুর একাত্ম হয়ে গেছে।

> " আমার মনে যে সুর জমে ছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি

আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ সে রচনা করলে না। সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড়ো কোন্‌টা ছোটো বোঝা গেল না।"২

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, রবীন্দ্রনাথ মানব-হৃদয়ের কবি। প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুর লীলা-বৈচিত্র্য, তার নব নব রঙের খেলা, বিভিন্ন ব্যঞ্জনা সব কিছুই তাঁর কথায় ও সুরে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। তেমনি মানব-মনের বিভিন্ন অনুভূতি, সুখ-দুঃখ, বিষাদ-আনন্দ, পাওয়া-না-পাওয়ার বেদনা - এ সবই কবির কাব্যে কি আশ্চর্যভাবেই না ব্যক্ত হয়েছে। বস্তুত, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচিত্র বিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখলে দেখা যাবে যে, তাঁর কবিতার ও গানের জগৎ স্বতন্ত্র পথে এগিয়ে গেছে। লক্ষ্য করা যায় যে, শুরু থেকেই তাঁর প্রায় প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থে কবিতার সঙ্গে কিছু গানও স্থান পেয়েছে এবং তা প্রায় শেষ অবধি অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্রকাব্যে এই বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছিলেন যে সকল কর্তব্যকে ছাপিয়ে তাঁর গান লেখার নেশা তাঁকে সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। তাঁর ভাষায়, " প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভার প্রকাশ করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে' - এতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনার রূপলীলা।" ৩ তিনি আত্মকথায় বলেছিলেন,

"চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভারান্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে দেখার রাজ্য গান শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কী নূতন অর্থ লাভ করে।" ৪

রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর গান যে কতখানি অন্তরের সামগ্রী ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁরই অসংখ্য গানের কথায়। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :-

১) 'গানের' ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।।

২) 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে -
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।।
বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখোনা তরী
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয় মাঝারে।'

৩) 'গানগুলি মোর, শৈবালের দল -
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।।

৪) গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে।।
ঐ যে তোমার ভোরের পাখি নিত্য করে ডাকাডাকি,
অরুণ আলোর খেয়ায় যখন এস ঘাটের পারে,
মোর প্রভাতীর গানখানিতে দাঁড়াও আমার দ্বারে।

৫) আমার যে গান তোমার পরশ পাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ?।
সুরে সুরে খুঁজি তারে অন্ধকারে,
আমার যে আঁখিজল তোমার পায়ে নাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ?

৬) গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।
দাও আমারে সোনার বরণ সুরের ধারা ঢেলে॥
... ...
সে সুর চাঁপার পেয়ালা ভরে
দেয় আপনায় উজাড় করে,
যায় চলে যায় চৈত্রদিনের মধুর খেলা খেলে॥

৭) কণ্ঠে নিলেম গান আমার শেষ পারানির কড়ি -
একলা ঘাটে রইব না গো পড়ি॥
আমার সুরের রসিক নেয়ে
তারে ডোলাব গান গেয়ে
পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি॥
পার হব কি নাই হব তার খবর কে রাখে -
দূরের হাওয়ায় ডাক দিল এই সুরের পাগলাকে।'

৮) 'আমার ঢালা গানের ধারা সেই তো তুমি দিয়েছিলে
আমার গাঁথা স্বপন-মালা কখন চেয়ে নিয়েছিলে,
মন যবে মোর দূরে দূরে
ফিরেছিলে আকাশ ঘুরে
তখন আমার ব্যথার সুরে
আভাস দিয়ে গিয়েছিলে॥'

৯) 'কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে -
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমার চেয়ে -
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়॥'

১০) 'আসা যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে
মোর কেটেছে দিন,
যাবার বেলায় দেব কারে বুকের কাছে
বাজল যে বীণ॥
সুরগুলি তার নানা ভাগে রেখে যাব পুষ্পরাগে
নীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণ লেখায়
করব বিলীন।'

১১) গানের ভেলায় বেলা-অবেলায় প্রাণের আশা
ভোলা মনের স্রোতে ভাসা॥
কোথায় জানি ধায় সে বাণী, দিনের শেষে
কোন্ ঘাটে যে ঠেকে এসে
চিরকালের কাঁদা-হাসা।

১২) 'আমি যে গান গাই জানিনে সে কার উদ্দেশ্যে॥
সবে জাগে মনে অকারণে চঞ্চল হাওয়া
প্রবাসী পাখি উড়ে যায় -
সুর যায় ভেসে কার উদ্দেশে॥'

১৩) 'তোমায় গান শোনাব
তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখজাগানিয়া॥

১৪) তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
বলেছে গান গাহিবারে॥
ফুলে ফুলে তারায় তারায়
বলেছে সে কোন্ ইশারায়
দিবস রাতির মাঝ-কিনারায় ধূসর আলোয় অন্ধকারে।
গাই নে কেন কী কব তা,
কেন আমার আকুলতা -
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা,
সুর যে হারাই অকূল পারে॥

১৫) ও গান গাস্ নে, গাস্ নে গাস্ নে।
যে দিন গিয়েছে সে আর ফিরিবে না-
তবে ও গান গাস নে ॥
হৃদয়ে যে কথা লুকানো রয়েছে -
সে আর জাগাস নে ॥

১৬) আমার সুরে লাগে তোমার হাসি,
যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ দোলে আসি॥
দিবানিশি আমিও যে
ফিরি তোমার সুরের খোঁজে,
হঠাৎ এমন ভোলায় কখন তোমার বাঁশি॥
আমার সকল কাজই রইল বাকি,
সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি।
আমার গানে তোমায় ধরব বলে
উদাস হয়ে যাই যে চলে,
তোমার গানে ধরা দিতে ভালবাসি ॥

১৭) আমার বেলা সে যায় সাঁঝ বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
... ...
গানের লীলার সেই কিনারে
যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্বহৃদয়পারাবারে রাগরাগিনীর জাল ফেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ? ।

১৮) হেথা যে গান গাইতে আসা
আমার হয়নি যে গান গাওয়া -
আজও কেবলই সুর সাধা, আমার কেবল গাইতে চাওয়া ॥

আমার লাগে নাই সে সুর,
আমার বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা। '

১৯) 'আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান॥
আমি তোমার ভুবন-মাঝে লাগিনি, নাথ,
কোনো কাজে -
শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ॥

২০) 'যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ বাহির বাটে
ততখন গানের পরে গান [redacted] গেয়ে মোর প্রহর কাটে॥
যবে শুভক্ষণে ডাক পড়ে সেই ভিতর সভার মাঝে
এ গান লাগবে বুঝি কাজে
তোমার সুরের রঙিন বাটে॥ '

২১) 'কেন তোমরা আমায় ডাক,
আমার মন না মানে।
পাই নে সময় গানে গানে ॥
পথ আমারে শুধায় লোকে,
পথ কি আমার পড়ে চোখে,
চলি যে কোন্ দিকের পানে গানে গানে॥'

২২) 'খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানে বাণী
দিনে দিনে ভাসাই দিনের তরীখানি,
স্রোতের লীলায় ভেসে ভেসে
সুদূরের কোন্ অচিন দেশে
কোনো ঘাটে ঠেকবে কিনা নাহি জানি॥'

২৩) দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি -
বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে যাবে জানি ॥
তবু তো ফাল্গুনরাতে এ গানের বেদনাতে
আঁখি তব ছলোছলো, এই বহু মানি॥

২৪) 'আমি তোমায় যত
শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান॥
ভুলবে সে গান যদি নাহয় যেয়ো ভুলে
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগরকূলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই কদিনের শুধু এই কটি মোর তান ॥'

২৫) কূল থেকে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে -
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পালটি তুলে।
যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে -
সেখানে নয়।
যেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে -
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরণলীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।।

উপরি উক্ত উদ্ধৃতিগুলির দিকে তাকিয়ে আমরা সহজে বুঝতে পারি নিজেকে বারংবার কবিরূপে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত গানকেই তাঁর প্রকৃত অভিব্যক্তি-রূপে গণ্য করেছেন। বস্তুতঃ, একথা নিঃশংসয়ে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে যদিও শিল্প ও সাহিত্যের বিচিত্র আঙ্গিককে আশ্রয় করেছিলেন, তবুও শেষপর্যন্ত কবিতা ও গান ছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রকৃত মাধ্যম।

গান এই সূত্রে - গান ও কবিতার পারস্পরিক সম্পর্কটি কিরকম সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। শিল্প হিসাবে কবিতাকে বলা যায় বাঙ্ময় অর্থাৎ বাক্ বা শব্দই যার মৌল উপাদান। এই বাক্ বা শব্দের ধ্বনিগত বিশ্লেষণ করলে আমরা সংগীত ধর্মীতার কিছু স্বাদ পাই। যদি আমরা পৃথকভাবে ধ্বনিগত বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক শব্দেরই একটা সাংগীতিক গুণ রয়ে গেছে। যাকে আমরা লিরিক বা গীতিকবিতা বলি, সেই গীতিকবিতার কথা সম্পদ বিশ্লেষণ করলে এ কথার যাথার্থ অনুভব করা যায়। গীতিকবিতা ছাড়াও লোক-সংগীতের কথা সম্পদের মধ্যেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একালে আমরা যা কাব্য হিসাবে পাঠ করি - সেই প্রাচীন বাংলা গানের

নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী এবং গীতিকা-র কথা সম্পদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সুর ছাড়াই কিভাবে এইসব গানের কথা সুরান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষভাবে যদি ব্রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর কথা ভাবি, তাহলে দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, ব্রজবুলিতে রচিত কথার নিজস্ব একটা ধ্বনিময় রূপ রয়ে গেছে। অর্থাৎ সুর ব্যতিরেকেই এইসব পদ যদি ঠিক মতন আবৃত্তি করা যায় তাহলে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সংগীতধর্মীতা এসে পড়ে।

সম্ভবত ব্রজবুলী শব্দের এই সাঙ্গীতিক গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেছিলেন। এই সঙ্গে যদি আমরা ইউরোপীয় সংগীতের দৃষ্টান্ত স্মরণ করে আইরিশ মেলোডিজের কথা ভাবি, তাহলে সেখানেও দেখব সেইসব মেলোডির কথা সম্পদের মধ্যে এক বিশেষ ধরণের সংগীতময়তা নিহিত রয়ে গিয়েছে। এক কথায় বলা যায়, কবিতার একটি সুন্দর সম্পদ হল - সংগীতময়তা যা তার অন্যতম স্বাভাবিক, গুণ। শব্দের বা কথার এই সাংগীতিক গুণের কথা মনে রেখেও আমরা তবুও কবিতাকে গান হিসাবে গণ্য করি না। আমরা তখনই একটি রচনাকে গান বলে চিহ্নিত করি যখন কথার সঙ্গে সুরকার একটি অতিরিক্ত সুর সংযোজন করেন। অর্থাৎ সুরের সংযোজনে কথা যখন গ্রথিত হয়ে ওঠে তখনই তাকে আমরা সংগীত আখ্যা দিই।

সুর অবশ্য দু-ভাবে রূপায়িত হতে পারে। ১) বিশুদ্ধ সুরের গ্রন্থনা ২) কথাসহযোগে সুরের গ্রন্থনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মার্গ বা ধ্রুপদী সংগীতের দিকে তাকালে আমরা দেখব সেখানে সুর কথা ছাড়াই আপনাকে বিকশিত করে। অন্যদিকে কথাকে আশ্রয় করেও সুর নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। আমাদের রাগাশ্রয়ী সংগীত - যেমন, খেয়াল গানে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে কথার ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। একটি গীত রচনায় কথা ও সুরের প্রাধান্য নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা চলে আসছে

সংগীতবিদদের মধ্যে। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও একদিন এই তর্কে অংশ গ্রহণ করেছিলেন দিলীপ রায় ও ধূর্জটীপ্রসাদের সঙ্গে।

দিলীপ রায়ের সঙ্গে কালিংপঙে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"দেখ আমি যখন গান বাঁধি তখনই সব চেয়ে আনন্দ পাই। মন বলে - প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা দিই, কর্তব্য করি, এ সবই এর কাছে তুচ্ছ। আমি একবার লিখেছিলাম -

যবে কাজ করি
প্রভু দেয় মোরে মান,
যবে গান করি
ভালোবাসে ভগবান।

একথা বলি কেন ? - এই জন্যে যে গানে যে আলোচনা মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্য বোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলায় আপন করে নতুন করে। ...

প্রকাশলীলায় গান কিনা সব চেয়ে সূক্ষ্ম ethereal তাই সে অপরের স্বীকৃতির স্থূলতার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয় নিজের হৃদয়ের বীণাকে সে রাঙিয়ে দেয় সুরে।" [৫]

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পত্রালাপ উপলক্ষে 'সুর ও সংগতি'তে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন -

"বাংলায় নতুন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুর মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ-উৎকর্ষ ঘটে, বাংলা সংগীতের তাই হওয়া চাই।" [৬]

এইসব আলোচনা সূত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিশ্লেষণ করলে দেখব, তিনি আসলে কথা এবং সুরকে সমান মর্যাদা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। সম্ভবত বাংলা গানের বিশিষ্ট

প্রকৃতি তাঁকে এমন একটি ধারনা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। যে চর্যাপদের কথা আগে বলেছি, তাতে দেখা যায় প্রত্যেকটি পদের সঙ্গে এক একটি রাগ-রাগিণী ব্যবহার করা হত। অর্থাৎ প্রত্যেকটি পদ ছিল রাগ-রাগিনী ভিত্তিক সংগীত। বলা বাহুল্য এইসব পদের সাংগীতিক রূপটি এখন আমরা ঠিকমতন ধরতে না পারলেও এটা বুঝতে পারি কথা অংশেরও প্রাধান্য দিয়েছিলেন সেই সব পদকর্তারা। বৈষ্ণব-পদাবলী সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। বাউল গানের ক্ষেত্রেও আমরা কথার প্রাধান্য দেখতে পাই। তাছাড়া উনিশ শতকে প্রচলিত টপ্পা গানের দিকে তাকালেও দেখা যায় সেখানেও গানের কথাকে কখনওই তুচ্ছ করা হয়নি। কথা জিনিষটা মানুষের আর গানটা প্রকৃতির। তাই কথার সঙ্গে সুরের সংযোগ হলে, সেই কথা তখন সব কিছুকে ছাড়িয়ে মানুষের সুখদুঃখ বেদনাকে সীমাহীন আকাশে ছড়িয়ে দেয়। গান মানুষের অন্তরের বস্তু। গীতিকবিতার রস পাঠ্য, আর গানের রস শ্রাব্য।

গীতিকবিতা আধুনিক কালে কেবলই কবিতা, গান নয়। তথাপি গান ও গীতি-কবিতার মধ্যে কোথাও সূক্ষ্ম সাদৃশ্যও আছে। বংকিমচন্দ্র তাঁর একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বলেছিলেন -

"গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। ... এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সংগীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত, মনুষ্য সংগীতপ্রিয়, এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত-বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয়না, অতএব সংগীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোনো নিয়মাধীন বাক্য-বিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি

... গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য, কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্ত-ভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রইল, আগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে .. লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বস্তুর ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।"[৭]

বাংলা-সাহিত্যের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ইতিহাস তাই কেবল কাব্যের বা কেবল সংগীতের ইতিহাস নয়। নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত কথাপ্রধান সংগীতের নাম দিয়েছিলেন কাব্যবন্ধ। আঠের উনিশ শতকের কবিওয়ালাদের গানের পর বাঙলা কাব্যসাহিত্যে গান ও গীতিকাব্যের সীমানা স্পষ্টরেখ হয়ে উঠেছে। মধুসূদনের আমিত্রাক্ষরের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সুরকে বর্জন করা, কিন্তু বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর গীতিকবিতায় সুরকে আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন। সংগীত প্রবণতাই বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক গীতিকবিতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। মনে হয় বাংলা গানের এই বিশিষ্ট প্রবণতা থেকেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গান সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা গড়ে উঠেছিল। যার ফলে তিনি কথা ও সুরকে সমান মর্যাদা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাহলে আমরা এমন কথা বলতে পারি যে, কবিতা ও গান, শিল্প হিসাবে অনেকাংশে কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

বহুকাল পূর্বে উপেন্দ্রকিশোর রায় এই বিষয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন, তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি -

"সংগীতের উপাদান দুইটি, ছন্দ আর সুর। কথা আর ছন্দের যোগে গান, উহা-অর্ধমিলন। কথা ছন্দ আর সুরের যোগে যে সংগীত উহা পূর্নমিলন। কথা হারিলে কবিতা, কবিতা হারিলে গান - এইরূপ করিয়া ইহারা ত্রয়েই আত্মাকে পরামাত্মার

নিকটস্থ করিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছিবার শক্তি ইহাদের কাহারও নাই। পরিণামে ইহাদের সকলকেই নিরস্ত হইতে হয়। শেষের সম্বল একমাত্র সেই প্রেম বা ব্যাকুলতা, যাহা হইতে সংগীতের উৎপত্তি। ইহাই আত্মার সংগীত। সে সংগীত কানে শোনা যায় না, প্রাণে ভোগ করিতে হয়।" [৮]

এখন যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখি তাহলে দেখব সেই সৃষ্টির প্রধান দুটি ধারা, কবিতা ও গান স্বতন্ত্র পথে কিন্তু পাশাপাশি এগিয়ে গেছে। কবি নিজেই বলেছিলেন যে, তাঁর কবিত্বের ইতিহাসে দেখা যায় - গান রচনা অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলনসাধনাই তাঁর প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে তিনি তাঁর হৃদয়াবেগের প্রকাশ করেছেন গানের মধ্য দিয়ে এবং পরে শেষ বয়সে এই প্রবণতা কাটিয়ে উঠে কবিতাকে তাঁর হৃদয়াবেগ প্রকাশের মাধ্যম করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়াবেগের প্রকাশ তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে কতখানি সংগীত সর্বস্ব ছিল তার প্রমাণ পাই তাঁর প্রথমদিকের কাব্য-গ্রন্থগুলির নামকরণের ভিতর দিয়ে। যেমন - (১) শৈশবসংগীত, (২) প্রভাতসংগীত, (৩) সন্ধ্যাসংগীত, (৪) কড়ি ও কোমল, (৫) ছবি ও গান। এই কাব্য-গ্রন্থগুলির নামকরণের ভিতর দিয়ে যেমন সংগীতের অনুসঙ্গ দ্যোতনা লাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি এই কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অসংখ্য গান সংকলিত হয়েছে যা ভাবগত বিচারে কবিতাগুলির সঙ্গে প্রায় অভিন্ন।

শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে যখন তাঁর কাব্য পরিণতি লাভ করেছে, তখনও দেখি একটা অধ্যায় রচিত হয়েছে যেখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিনটি গীতধর্মী রচনা। প্রমথনাথ বিশী যাকে বলেছেন - গীতাখ্যকাব্য, যথাক্রমে 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি।' তাছাড়াও 'পূরবী,' 'শেষসপ্তক,' 'সানাই' ইত্যাদি নামকরণেও রয়েছে গানের অনুষঙ্গ। কিন্তু

শুধু নামকরণের দিক থেকেই নয়, আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য সংকলনেও কবিতার পাশাপাশি একই সঙ্গে অসংখ্য গানও স্থান পেয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় কবির হৃদয়াবেগ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গান ও কবিতা কতখানি অভিন্ন ও অন্যোন্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে গান ও কবিতা পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, সেসব গান বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেই গানগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির সম্পর্ক খুবই নিবিড়। অবশ্য একথা আমাদের জানা আছে যে, যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ রচনার কাজে ব্যাপৃত, তখন তিনি স্বতন্ত্রভাবে গানও রচনা করে চলেছেন যার বিস্তারিত বিবরণ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী' গ্রন্থে পাওয়া যায়। লক্ষ্য করা দরকার যে এইসব কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে নির্বাচিত কিছু কবিতাকে সুরান্বিত করে তিনি তাঁর কাব্য গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে আমরা একথা বলতে পারি যে, কবিতা ও গানের জগৎ যে আলাদা একথা জেনেও রবীন্দ্রনাথ সেইসব গানকে তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ধরে রেখেছেন ভাবগত বিচারে যেগুলি উদ্দিষ্ট কাব্যগ্রন্থগুলির কবিতার সঙ্গে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে গানের ঐক্য গড়ে উঠেছে।

কবিতা ও গান এইভাবে একসঙ্গে গ্রথিত হওয়ার পর দেখা গেল, একটা সময় এসেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে যখন তিনি কবিতা ছেড়ে গানই রচনা করে চলেছেন। প্রমথনাথ বিশী প্রসঙ্গক্রমে 'খেয়া'-পরবর্তী তথা 'বলাকা'-পূর্ব রবীন্দ্রকাব্যধারার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ যখন এইভাবে শুধুমাত্র গানই রচনা করে চলেছেন তখন সেকালের পাঠক সমাজের ধারণা দাঁড়িয়েছিল - অতঃপর রবীন্দ্রনাথ আর কোনো

148825

31 OCT 2002

কবিতা রচনা করবেন না। গান লিখেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করবেন।

১৯০৬ আষাঢ়ে কবির 'খেয়া' কাব্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যখানি বড়ই নিঃসঙ্গ। প্রমথনাথ বিশীর মতানুসারে রবীন্দ্রকাব্যে সাধারণতঃ এ নিঃসঙ্গতা দেখা যায় না। কবির কাব্য সচরাচর দুটিনটিতে মিলে অল্প সময়ের ব্যবধানে ঝাঁক বেঁধে আসে- তারা এক জাতের পাখী, সময়ের হিসেব করলে দেখা যায় 'খেয়া' কাব্যের আশে পাশে আগে পিছে খুব একটা উল্লেখযোগ্য কাব্য নেই। 'খেয়া' কাব্যের প্রকাশকাল ১৯০৬ আষাঢ়। পূর্ববর্তী 'নৈবেদ্য' ১৯০১, 'শিশু' ও 'স্মরণ' ১৯০৩। পরবর্তী কাব্য 'গীতাঞ্জলি'র প্রকাশ ১৯১০। এই সময়ে অজস্র গদ্য রচনা করেছেন, প্রধাণত ধর্ম সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে। "নিঃসঙ্গ খেয়া কাব্যের দোসর নাই, কিন্তু তাহার তুলনা আছে। বাংলাদেশের জনমানবহীন বৃক্ষবনস্পতিহীন বিশাল প্রান্তরের প্রান্তে নদীতীরবর্তী খেয়াঘাটের নিঃসঙ্গ ছায়াবটের রাজকীয় মহিমা 'খেয়া' কাব্যের যথার্থ তুলনা।" [৯] 'খেয়া' কাব্যের পর রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্য 'গীতাঞ্জলি'। 'খেয়া' কাব্যের শেষ ও 'গীতাঞ্জলি'-র রচনার শুরু ১৩১৩ পরস্পরকে স্পর্শ করে। আবার 'গীতাঞ্জলি'র শেষ রচনাকালকে (১৩১৭) ছুঁয়ে গেছে 'গীতিমাল্যে'র প্রথম তিনটি সংগীত রচনা ১৩১৬ সালে। 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র রচনাকালের বিশেষ পার্থক্য নেই। 'গীতিমাল্যে'র শেষ গান রচনার তারিখ ৩রা আষাঢ় ১৩২১, আর 'গীতালি'র প্রথম গান রচনার কাল ১৩২১-এর শ্রাবণ। গীতাত্ম্য কাব্যত্রয় পরপর প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রানুরাগীগণ এই মনে করে শংকিত হয়ে উঠলেন যে, কবির কাব্য-প্রতিভা বোধকরি নিঃশেষ হয়ে গেল, তাই ছোট ছোট গান ও গীতি-কাব্যের মধ্য দিয়েই তাঁর কাব্য রচনার প্রকাশ ঘটছে।

"তাঁহারা ভাবিলেন, যে দিব্যপ্রতিভা ভাষা ও ছন্দের যাদুতে 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'কল্পনা কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বুঝি এতদিনে দেউলে হইয়া পড়িল।" [১০]

এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময় নিয়ে নবরূপে আবির্ভূত হল 'বলাকা কাব্য।

বস্তুত কবিজীবনের প্রথম লগ্নে রবীন্দ্রমানস যে কতখানি সংগীতের দ্বারা পরিবৃত ছিল তার আরও প্রমাণ পাই ১২৮৮ সালে সংগীত সম্পর্কে লিখিত তিনটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে - 'সংগীত ও ভাব' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮), 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' (আষাঢ় ১২৮৮) এবং 'সংগীত ও কবিতা' (মাঘ ১২৮৮)। এছাড়া তিনি বৈশাখ ১৩১১ সালে আরেকটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম 'গান সম্মুখে প্রবন্ধ'। এই বছরেই 'সংগীত' শীর্ষক আরেকটি প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছিলেন। ভাদ্র ১৩২৪ সালে সংগীতের যুক্তি' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। পরবর্তীকালেও তাঁকে সংগীত সম্পর্কীয় আলোচনায় অংশ নিতে দেখি।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ১২৮৮ সালে লিখিত প্রবন্ধ তিনটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার কারণ এই যে, এই তিনটি প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনের সংগীত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন, এই তিনটি প্রবন্ধের মূল বক্তব্যটুকু নীচে উদ্ধৃত করা গেল।**

১) "সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায়। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়; সংগীত আর কিছু নয় - সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।[১১]

২) "সংগীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন, কেবলমাত্র ছন্দ, কানে মিষ্ট শুনাক তথাপি অনাবশ্যক। ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি, ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র - সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই।"[১২]

৩) "গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই, তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলা চেতনাহীন 'জড়' সুরের উপর স্থাপন করেন,

---

** এখানে প্রাসঙ্গিক কয়েকটিমাত্র প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা হল। বিশ্বভারতী প্রকাশিত (১৯৬৬) 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে।

আমি তাহাকে জীবন্ত আমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বসাইবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।" [১৩]

এখানে তিনি গানের কবিতা ও সাধারণ কবিতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি আরও বলেছেন গানের কবিতা হচ্ছে শোনবার জন্য অর্থাৎ তা সংগীত। আর সাধারণ কবিতা পড়বার জন্য।

সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা সম্মুখে বলতে গিয়ে কবি বলেছেন -

৪) "আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায় সুরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত নিজের উত্তেজনা প্রকাশের উপায় ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়।" [১৪]

৫) "অনুভাব প্রকাশের ভাষার অত্যন্ত উন্নতিই সংগীত।" [১৫]

সংগীত সম্মুখে তাঁর মত প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে ভাব প্রকাশের উপায় স্বরূপ বলেছেন। তিনি বলেছেন -

"আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাহাকে আমরা শুধুমাত্র 'কথার সমষ্টি' স্বরূপে দেখি না - কথার সহিত ভাবের সম্মুখ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়-স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সংগীত সুরের রাগরাগিণী, নহে, সংগীত ভাবের রাগরাগিণী। আমাদের কথা এই যে কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা।" [১৬]

তিনি আরও বলেছেন :

৭) "আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে - কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমনকি সুরের উপরই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে।"

"... কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই।"

"... সংগীত অবিকল কবিতার ন্যায়। সংগীতেও ছন্দ আছে।" [১৭]

৮) "সংগীত ও কবিতা উভয়ে ভাবপ্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। তবে, কবিতা ভাবপ্রকাশ। সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে সংগীত ততখানি করে নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ আছে। শূন্যগর্ভ কথার কোনো আকর্ষণ নাই - না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কানে তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরেরএকটা আকর্ষণ আছে, তাহা কানে মিষ্ট শুনায়। এইজন্য--ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সংগীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। ...

.... মিষ্ট সুর শুনিবামাত্রই ভালো লাগে, সেই নিমিত্ত সংগীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাব কর্ষণ করিতে হয় নাই - কিন্তু শুধুমাত্র কথার যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চা করিতে হইয়াছে। সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সংগীতের এমন অবনতি।

অতএব দেখা যাইতেছে। যে, কবিতা ও সংগীতে আর কোনো তফাৎ নাই - কেবল ইহা ভাবপ্রকাশের একটা উপায়, উহা ভাবপ্রকাশের আর একটা উপায় মাত্র। ...

... সংগীত একটি স্থায়ী স্থিরভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। সংগীত ও কবিতায় আমরা আর কিছু প্রভেদ দেখিনা, কেবল উন্নতির তারতম্য। উভয়েই যমজ ভ্রাতা, এক মায়ের সন্তান, কেবল উভয়ের শিক্ষার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে মাত্র।

দেখা গেল সংগীত ও কবিতা এক শ্রেণীর।" [১৮]

কবি সংগীত ও কবিতাকে এক সূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন। একটি আর একটি থেকে অভিন্ন। তিনি চেয়েছেন সংগীতও যেন কবিতার মত স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়, তা যেন কতকগুলি নিয়মের মধ্যে বদ্ধ হয়ে না থাকে।

"কবিতার যে স্বাধীনতা আছে সংগীতেরও সেই স্বাধীনতা হউক, কারণ সংগীত কবিতার ভাই। যেমন সন্ধ্যার বিষয়ে কবিতা রচনা করিতে গেলে কবি সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করিয়া থাকেন ও তাঁহার প্রতি কথায় সন্ধ্যা মূর্তিমতী হইয়া উঠে, তেমনি সন্ধ্যার বিষয়ে গান করিতে গেলে রচয়িতা যেন চোখ কান বুজিয়া পূরবী না গাহিয়া যান - যেন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করেন - তাহা হইলে অবসান-দিবসের ন্যায় তাঁহার সুরও আপনা-আপনি নামিয়া আসিবে, মুছিয়া আসিবে, ফুরাইয়া আসিবে। প্রত্যেক গীতিকবির রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার হইতে থাকিবে। তাহা হইলে গানের বাল্মীকি গানের কালিদাস জন্মগ্রহণ করিবেন।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর প্রবন্ধে সংগীত ও কবিতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন, তেমনি সংগীত সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উল্লেখও বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সংগীতের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো সংগীত সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন -

"বিশুদ্ধ আনন্দের উৎস হল বর্ণ, আকার, গন্ধ ও ধ্বনি এবং এগুলি আপেক্ষিক রূপে সুন্দর নয়, স্বয়ং সুন্দর। বিশেষভাবে সুরধ্বনি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হল - সেই সমস্ত ধ্বনি যেগুলি বিশুদ্ধ ও অনাবিল এবং একক শুদ্ধধ্বনি সৃষ্টি করে, সেগুলি অন্যের সম্পর্কে সুন্দর নয়, তাদের নিজস্ব প্রকৃতিতেই সুন্দর।" [২০]

প্লেটো চিত্র ও কাব্যের মত সংগীতকেও অনুকরণাত্মক রূপে দেখেছেন এবং প্লেটোর কাছে সংগীত অন্তঃপ্রকৃতির অণুকরণ বা মনের অনুভূতির প্রতিচ্ছবিরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

"সংগীত যে লৌকিক ভাবসমূহের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত এবং বিশেষ বিশেষ সুররূপ (Mode) ও ছন্দের মধ্যে যে লৌকিক অনুভূতির ব্যঞ্জনা থেকে গেছে - রিপাব্লিকের আলোচনায় আমরা প্লেটোর এই সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত হই।"[২১]

"সংগীতের সঙ্গে আত্মার নিগূঢ় সম্পর্কটি প্লেটো অনুভব করেছিলেন, তাঁর মতে আত্মার অতি গভীরে ছন্দ ও সুরসঙ্গতির প্রভাব বিস্তারিত হয় এবং এই কারণেই সমাজে সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী"। [২২]

"ক) প্লেটোর মত অ্যারিস্টট্‌লও সংগীতকে অনুকৃতিরূপে দেখেছেন। বাঁশী ও বীণার উল্লেখ করে অ্যারিস্টট্‌ল বলেছেন ঐ সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের নানা সুর সাধারণ ভাবে অনুকরণরূপেই প্রতীত হয়। (খ) এবং অনুকরণের আধার হল ছন্দ ও সুরসঙ্গতি, যেমন রেখা ও বর্ণ বিভিন্ন রূপানুকরণের মাধ্যম। অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংগীতও অনুকরণাত্মক এবং ছন্দ ও সুরের সুসঙ্গত বিন্যাসের আধারে অনুকরণের কাজটি সম্পাদিত হয়।" [২৩]

অ্যারিস্টট্‌ল আরও বলেছেন সংগীতের অনুকরণীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে মনের ভাব। প্লেটোর মত অ্যারিস্টট্‌লও বিভিন্ন মোডকে বিভিন্ন ভাবের আধার বলে মনে করেন।

"অ্যারিস্টট্‌লের ধারণা সুর ও ছন্দ-রূপায়িত ভাবসমূহ মনের মধ্যে যে আনন্দ বা বেদনার সংকার করে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই অর্থাৎ সংগীত ভাব ও অভিজ্ঞতার বাস্তব নিদর্শন।" [২৪]

সংগীতের গুণগত বিচার যদি আমরা করতে যাই তাহলে দেখি যে - Susanne K. Langer তাঁর 'Phylosophy in a new key' - গ্রন্থে সংগীতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন -

"Music is not self-expression, but formulation and representation of emotions, moods, mental tensions and resolution - a 'logical picture' of sentiment, responsive life, a source of insight, not a plea for sympathy." [২৫]

হ্যানস্‌লিক তাঁর 'সংগীতে সুন্দর' (The beautiful in Music) গ্রন্থে বলেছিলেন -

"কাব্য যেন রেখাংকন, কণ্ঠসংগীত তাকে বর্ণরঞ্জিত করে। সাংগীতিক উপাদানের মধ্যে আমরা অত্যুজ্জ্বল এবং সূক্ষ্ম বর্ণাভা এবং সাংকেতিক অর্থের প্রাচুর্য আবিষ্কার করতে পারি। ... সংগীত নয় ভাষাই কণ্ঠসংগীতের বিষয়বস্তু নিরূপন করে থাকে।" [২৬]

রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগীতা' প্রবন্ধে (সংগীতচিন্তা' গ্রন্থ) এ ধরণের কথা বলেছিলেন - "বুদ্ধির ভাষাও যেমন উন্নত হইতে থাকে, আবেগের (emotion)ভাষাও তেমনি উন্নত হয়। এখন কথা এই, সংগীত আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎ-সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার (language of the emotions) পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে। আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল।" [২৭]

বিভিন্ন দার্শনিক বৃন্দের সংগীতচিন্তার ধারা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা - অ্যারিস্টটলের সংগীতচিন্তার আর একটি দিক লক্ষ্য করি যেখানে তিনি সুরসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন -

"Why do the other tones sound badly when the tone of the middle string is altered ? But if the tone of the middle string remains, and one of the other is altered the altered one alone is soiled ? It is because that all are tuned and have a certain relation to the tone of the middle string ?" [২৮]

সংগীত ও ভাব সম্বন্ধেও আমরা রবীন্দ্রনাথের একই ধরণের মনোভাবের পরিচয় পাই।

"রাগ রাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল ? ভাব প্রকাশ ব্যতীত আর তো কিছু নয়। আমরা যখন কথা বলি তখনও সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গ-লীলা থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবপ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র।" ২৯

অ্যারিস্টটলের মতো রবীন্দ্রনাথের সংগীত চিন্তার মধ্যেও আমরা সুরসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাই। সেখানে তিনি বলছেন -

"যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায়, আর তাহাতে বর্ণণীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুণ, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন।" ৩০

সুসান ল্যাঙ্গার তাঁর 'Philosophy in a new Key'- গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন, "সংগীতের অনুভূতিতে এক অনন্য সাধারণ উপলব্ধি রয়ে গেছে, লৌকিক দৃষ্টিতে যার প্রকৃত স্বরূপটি বোধ্য নয়। সংগীতের উপলব্ধি ভাবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের উপলব্ধি।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এমনইএকটি চিন্তা-ধারার উল্লেখ পাই। সেখানে তিনি বলেছেন,

" গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে নাড়া দেয়, সে কোনো ঘটনার উপলক্ষ দিয়ে নয়, সে একেবারে অব্যবহিতভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহেতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দন বেগেই নিজেকে মানে বাইরের সঙ্গে কোনো ব্যবহারের যোগে নয়।" ৩১

হ্যানস্‌লিক তাঁর 'The beautiful in music'- গ্রন্থে বলেছিলেন -

"Music does not, for example, present the concept or image of death itself. Rather it connotes that rich realm of experience in which death and darkness, night and cold, winter and sleep and silence are all combined and consolidated into a single complex."[৩২]

সংগীতের এই সামান্য অর্থটি রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত উক্তিতে স্পষ্ট -

"গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জাগিয়ে দেয়, সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয় সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলছে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা, দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদি নির্ঝরের কল-কল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।" [৩৩]

অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির গীতময় সত্তা যেন নিরন্তর সংগীতের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের অন্তরে প্রবাহিত হয়ে আমাদের চেতনাকে এক অসীমলোকে পৌঁছে দিচ্ছে।।

: উল্লেখপঞ্জী :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্ররচনাবলী - আত্মপরিচয় - ৪ সংখ্যক, ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮ শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী : সুলভ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক : পৃ.১৭০

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতচিন্তব - আমাদের সংগীত : বিশ্বভারতী : প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৩ : ১৮৮৮ শক : পৃ. ৭৩

৩. তদেব : সুর ও সংগতি : পৃ.১৭১

৪. তদেব : আত্মকথা (জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা) পৃ.১৮১

৫. দিলীপকুমার রায় : তীর্থংকর : রবীন্দ্রনাথ : কালচার পাবলিশার্স : তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫০ : পৃ.১৬৫

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতচিন্তা - সুর ও সংগতি, পৃ.১৭৬

৭. বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বংকিম রচনাবলী (২য় খণ্ড - সমগ্র সাহিত্য) : প্রকাশক : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ - অষ্টম মুদ্রণ ১৩৯০ : পৃ.১৮৭

৮. উপেন্দ্রকিশোর রায় : ভারতীয় সংগীত : প্রবাসী পত্রিকা ১৯১৯ ফাল্গুন।

৯. প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রসরণী : ঘরেও নহে পরেও নহে : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : পঞ্চম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ : পৃ.১১৬

১০. তদেব : হেথা নয়, অন্য কেথা, অন্য কোনখানে : পৃ.১৪৭

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীত-চিন্তব : সংগীত ও ভাব : বিশ্বভারতী : পৃ.৪

১২. তদেব : সংগীত ও ভাব : পৃ.৭ - ৮

১৩. তদেব : পৃ.৮

১৪. তদেব : সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগীতা : পৃ.১২

১৫. তদেব : পৃ.১৬

১৬. তদেব : সংগীত ও কবিতা : পৃ.১১

১৭. তদেব : পৃ.২২

১৮. তদেব : পৃ.২২ - ২৪

১৯. তদেব : পৃ.২৫ - ২৬

২০. অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীতে অনুকৃতিবাদ : সংগীতের শিল্পদর্শন : দে বুক স্টোর্স - প্রথম প্রকাশ, কার্তিক, নভেম্বর ১৯৭৫ : পৃ.৬

প্লেটোর বক্তব্য -

"Such sounds as are pure and smooth and yield a a single pure tone are not beautiful relatively to anything else, but in their proper nature" -

Plato

২১. অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীতে অনুকৃতিবাদ : সংগীতের শিল্পদর্শন : পৃ.৩-৪

২২. তদেব : পৃ.৪ - (প্লেটোর বক্তব্য) -

"Is not musical education of paramount importance for those reasons, because rhythim and harmony enter most powerfully into the innermost part of the soul

(Republic-401, Plato)

২৩. তদেব : পৃ.৬ (প্লেটোর মতবাদ) -

a) "The music of the flute and of the lyre in most of their of forms, and all in this general conception modes of imitation.

(Page-7, Plato's Poetic I)

b) "For as there are persons who, by concious art are mere habit, imitate and represent various objects

through the medium of colour and form ... This is the music of the flute and of the lyre 'harmony' and rhythim alone are employed.

২৪. অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীতে অনুকৃতিবাদ : সঙ্গীতের শিল্পদর্শন : পৃ.৬ - ৭

২৫. Susanne K. Longer : Phylosophy in a new Key : MENTOR Book : Published by the New American Library : Third Printing March 1951 : Page-180

২৬. ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য : সংগীতে সুন্দর : জিজ্ঞাসা : প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭৬, আগষ্ট ১৯৬৯ : পৃ.৪৮

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতচিন্তা : সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা : বিশ্বভারতী : প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৩ : ১৮৮৮ শক : পৃ.১৩

২৮. হারমান হেলমহোলৎস : Problem 19 : On the sensation of tone : -ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য : সংগীতে সুন্দর : পৃ.২৪১

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীত চিন্তা : সংগীত ও ভাব : পৃ.৪

৩০. অদেব : পৃ.৪

৩১. অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীতের শিল্পদর্শন : সংগীতে ভাববাদ : পৃ.৬৭

৩২. অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীতের শিল্পদর্শন : The beautiful in music : পৃ.২৬৫

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীত চিন্তা : ছন্দের অর্থ : পৃ.২২৮